ঘাতক

অভিজিৎ তরফদার

আমারভালো নাম প্রলয়, বাবার দেওয়া, মা আমাকে পলু বলে ডাকত। মা নেই।বাবাও আর কথা বলতে পারে না।
ওস্তাদ আমাকে 'প্যালা ' বলে ডাকে।ওস্তাদের ডাক প্যালা সারাদিন শুনতে শুনতে আমি আগের নামগুলো ভুলে গেছি। এখন কেউ প্রলয় বা পলু বলে ডাকলে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে থাকি। ওস্তাদের চ্যালারাও আমাকেপ্যালা বলে। প্যালা শুনতেই আমারভালো লাগে।
ওস্তাদকেও কিন্তু অনেকে অনেক নামে ডাকে। ওস্তাদ নাকি আগে প্রাইমারি স্কুলেপড়াত। সেই স্কুল উঠে গেলেও ওস্তাদের মাস্টার নামটা থেকে গেছে।মাস্টারি নাকি এমন জিনিস, যা ধুলে ঘষলেও ওঠে না। কর্ণের কবচ-কুণ্ডলের মতন। এটা অবশ্যবাবার কথা। বাবার মুখে রামায়ণমহাভারত আমাদের ছোটবেলাটা ছেয়ে ছিল। তাই কথায় কথায়অর্জুন-যুধিষ্ঠির, রাম-লক্ষ্মণ এসে যায়।
পরে অবশ্য ওস্তাদ মাস্টারিটা অন্যদিকে ছড়িয়েদিল। ক্যারাটে-জুডো-কুংফু। প্রথমে নন্দন ক্লাবের মাঠে শেখাত। সকাল ছ-টা থেকে সাড়ে সাতটা, বিকেলচারটে থেকে ছ-টা । পরে ক্লাবের প্রেসিডেন্ট অনন্ত বরাটের সঙ্গে ঝামেলা হলে ওস্তাদ আখড়াটাসরিয়ে আনল গঙ্গার ধারে মোহন্তদের পুরোনো বাড়িতে। মোহন্তরা ওস্তাদের কাছ থেকেকত ভাড়া নেয়? কেউ জানে না। তবে মোহন্তদের জাতশত্রু অনন্তবরাট গঙ্গায় স্নান করতে নেমে যখন উঠল না, লোকে ফিসফিস করে বলেছিল,নিতাই ঋণ শোধ করল।
হ্যাঁ, ওস্তাদের আর এক নাম নিতাই। এলাকার পুরোনো বাসিন্দারা ওস্তাদকেওই নামেই চেনে। তারা ওস্তাদেরবাবা বলাই প্রামাণিককেও চিনত। তাদের দেখলে ওস্তাদ হাত তুলে কপালে ঠেকায়, ভালোআছেন তো হাজ্যাঠা? হা জ্যাঠাও ডানহাত সামনে বাড়িয়ে, 'কল্যাণ হোককল্যাণ হোক' বলতে বলতে এগিয়ে যান। নিতাইয়ের কল্যাণেই যে সকলের কল্যাণ, কে না জানে?
নিতাই মাস্টারের ক্যারাটে-কুংফু-জুডোরআখড়া সকাল-বিকেল নির্দিষ্ট সময় খোলা। ভেতরে জিমনাসিয়ামও বসিয়েছে ওস্তাদ। সেখানে বড়লোকের মাখন মাখন ছেলেরা যন্ত্রনিয়ে ঘাম ঝরায়। ওস্তাদ তাদেরপকেট হালকা করে বাড়ি ফিরিয়ে দেয়।ওস্তাদকে ওস্তাদ বলে খুবঅল্পসংখ্যক মানুষ। জগাবল্টু-নীলু। লিস্টে শেষ নাম আমার। অন্যদের ট্রেনিং শেষ হয়ে গেছে। বড় বড় অপারেশনে ওদের দরকার পড়ে, ওস্তাদ এখন আমাকেনিয়ে পড়েছে।
একটা কার্ডবোর্ডের মানুষ বানিয়েছে ওস্তাদ। মানুষটার হাত-পা-পেট-বুক যেমনতেমন, কেবল মাথাটাই সুন্দর করে আঁকা। চোখ-নাক-কপাল-কান নিখুঁত।
ওস্তাদ বলে, মানুষের সবই দুটো দুটো করে ।হাত-পা-ফুসফুস। হার্ট একটা,কিন্তু তাও কখনও কখনও ডানদিকের বদলে বাঁদিকে থাকে। শরীরে একটাএকা ব্রেন, মস্তিষ্ক। অন্য যে কোনওঅঙ্গ ছুঁয়ে গেলে মানুষ বেঁচেও যেতেপারে। ব্রেনে তা হয় না। ছুঁলেই শেষ। তাই লক্ষ্য হবে মস্তিষ্ক। কারণ, তুমি একটার বেশি সুযোগ পাবে না। দ্বিতীয় গুলিটা করার জন্য অস্ত্র তোলারআগেই ওপক্ষের গুলি তোমাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দেবে।
মস্তিষ্ক, ব্রেন। ওটাই বারবার এঁকে দেখাতওস্তাদ। লাল কালি দিয়ে দাগিয়েদিয়েছিল। বলেছিল, অর্জুনের মাছের চোখের মতো লক্ষ্যভেদ করতে হলে ব্রেনছাড়া অন্য কিছু দেখা চলবে না।
তার জন্যে খরচও কিছু কম হয়নি। বুক-পেট বিরাট জায়গা। তাক করে ঝেড়ে দিলেই হল। কোথাও না কোথাও গিয়ে

বিঁধে যাবে। খুপরির মধ্যে ছোট্ট জায়গায় ঘাপটি মেরেবলে আছে ব্রেন । তিনবার ছুঁড়লে একটা ঠিক জায়গায় পৌঁছয়। ওস্তাদের হেলদোল নেই। সোজা সাপটা বলে দিয়েছে, যেদিন পরপর তিনখানা গুলিদু-চোখের মাঝখানে, এক ইঞ্চি ওপরে কপাল ফুটো করে চালাতে পারবি,সেদিন বুঝব হয়েছে। তার আগে থামা নেই, চালিয়ে যা।

চালিয়ে যা। ওস্তাদের আর কী ? গুলির দাম ধরা আছে ওস্তাদের । একসঙ্গে হিসেব হবে। পাঁচ হাজার। আমারবরাদ্দ। তার থেকে গুলির দাম বাদযাবে। দশটা গুলিতে ট্রেনিং শেষ হলেআমার ভাগে যা থাকবে, পঞ্চাশটা গুলি খরচা হলে থ াকবে তার চেয়ে অনেককম।

অবশ্য কোনওদিকেই ক্ষতি নেই । কাজটা তুলতেপারলে ওস্তাদ দলে ঢুকিয়ে নেবে। তখন মাসমাইনের কারবার। বড় অপারেশনের পর বোনাস।

যে-কাজটার জন্যে ওস্তাদ আমাকে নিয়েছে, তার জন্যকত টাকার সুপারি নিয়েছে আমি জানি না। কেউই জানতে পারে ন া। জগা, যে অতদিন আছে, সেও কোনওদিনজানার চেষ্টা করেনি। আমার জন্যে পাঁচ হাজার, মাইনাস গুলির দাম।আমি সেটাই হিসাব করি।

একদিক থেকে ওস্তাদ খুব কম দিচ্ছে বলা যাবে না। যন্তরটাও তো ওরই । যন্ত্র আমদানি, সাফসুতরো রেডি রাখা, ট্রেনিং, অর্ডার ধরা,কাজ শেষ হলে ক্যাশ হাসিল করা,-- কাজ কি একটা? তা ছাড়াও আছে। শুধুঅর্ডার নিলেই হল ন া। টার্গেট সম্বন্ধেখবর সংগ্রহ করা— তার চলাফেরা, বডিগার্ড, কোন সময়ে পাওয়া সহজ,কখন একা থাকে। ছক কষে ট্রেনিংদিয়ে হাতে মাল ধরিয়ে দানা ভরে তবে পাঠায় ওস্তাদ। তোমার কাজ ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায়পৌঁছে ঠিক মানুষের ওপর ঝেড়ে দিয়ে আসা। সেইভাবে ভাবলে ওস্তাদের তুলনায় খুবই কম মেহনতের কাজ।

বিহার থেকে মাল আসে। ছ-ঘরা জিনিসগুলো দামি। ওসব আমাদের দেয় না। খদ্দের আছে। তিরিশ চল্লিশ হাজারে বিক্রি হয়। ট্রেনিং হয় লম্বা-নল যন্ত্রগুলোতে। ওস্তাদ বলে ওয়ান-শটার। মানে একটাই গুলি। একগুলিতে খতম। তবে সামান্য গোলমালহয়ে গেলে তোমার খুপরিও সিসের বিচিতে বোঝাই করে দেবে অন্যপক্ষ। আর অন্যপক্ষ যদি নাও দেয়,ওস্তাদই কাউকে পাঠিয়ে, পুলিশের গাড়ি থেকে নামানোর সময় কিংবাআদালত-চত্বরেই, নিকেশ করে দেবে।

তবে ভেবেচিন্তেই তো ওস্তাদের আখড়ায়নাম লিখিয়েছি। এখন পেছনে তাকিয়ে কীলাভ ? মন দিয়ে নিশানা অভ্যাস করে যাই।

মহাভারত যদি ঠিকমতো পড়িস দেখবি, কৌরবরা যা যাঅন্যায় করেছিল, যতটুকু পাপ করেছিল, পাণ্ডবরা করেছিল ত ারএকশোগুণ। কৌরবরা কী করেছিল ? না পাণ্ডবদের রাজত্ব দেয়নি। দেবে কেন? রাজার ছেলে তারা। রাজত্ব তাদের প্র াপ্য। তোমরা সারাটা জীবন পায়ে পা লাগিয়েঝগড়া করে এলে, দুনিয়ার কাছে প্রমাণ করার চেষ্টা করে এলেতোমরাই শ্রেষ্ঠ, আর গিয়ে চাইলেই সুড়সুড় করে অর্দ্ধেক রাজত্ব দিয়ে দেবে ? লড়াই করে নাও। তা কীহল সেই যুদ্ধে ন্যায় যুদ্ধ ? কৌরবপক্ষের একটা সেনাপতিকেও ন্যায়যুদ্ধে হারিয়েছিস তোরা ? ভীষ্ম! অতবড় মহারথী। না পেরে কী করলি ? না একটা শিখণ্ডীকেসামনে দাঁড় করালি। ভীষ্ম জানতেনও নারী । অস্ত্র নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কাপুষের মতো নিরস্ত্র ভীষ্মকেক্ষতবিক্ষত করে শুইয়ে দিলি। এটা যুদ্ধ ? এটা ন্যায় ? ছি ছি ছি।

মাংসের গন্ধেসারা বাড়ি ম-ম করছে। চাকা চাকা করে আলু কেটে হাঁড়িতেছেড়েছে মা, একটু আগেই দেখে এসেছি। দু-বার কুকুরের মতো উনুনের পাশে দাঁড়িয়ে গন্ধ শুঁকেএসেছি। মা লক্ষ করেছে। হাসি আঁচলে লুকিয়ে বলেছে, অ াজকেরপাঁঠাটা বুড়ো ছিল রে, সেদ্ধ হতে দেরি লাগবে। বাবার কাছে গিয়ে বোস্। ঠিক সময়ে ডেকে আনব।

রোববারের বেলা বারোটা। শীতের রোদ পিঠে করে পা ছড়িয়ে বাবা তেল মাখছে। কড়ে আঙুলের ডগায় তেল নিয়েন াইকুণ্ডলীতে লাগাতে লাগাতে বাবা বলল, চল্, একটা গামছা নিয়ে নে। দুজনে গঙ্গায় চান্ করে আসি। লাফিয়ে উঠে ম াকে বলতে ছুটলাম। হলুদ-লাগা হাত আঁচলে মুছে মা কপালের চুলসরিয়ে গলা তুলল, ও কিন্তু জল দেখলে ভীষণ হুটো াপাটি করে।

বাবা সস্নেহে আমার পিঠে হাত রেখে বলল, কক। আমি তো আছি। বাবার পেছন পেছন গঙ্গার ঘাট। রাস্তায় পায়ের ছ াপ এঁকে ফিরে আসা। অসনপিঁড়িহয়ে বসে বাপ-বেটায় মাংসভাত। সামনে,একটু দূরে হাতপাখা হাতে মা।

বাড়িতে লম্বা লম্বা ফর্দের মতো কাগজ আনত বাবা। এক একটা ফর্দে এক একজনের নাম লেখা। খাতা দেখে নাম বলে

দিতাম আমি- হেমেনদাস, আকবর আলি, ব্রিজলাল যাদব। বাবাহিসেব করে টাকা অঙ্ক বসাত। দু-একজন ছিল, ব্রিজলালের মতো, বছরে দু-বার মুলুক যেত। হাতে পায়ে ধরত। ফিরে এসে কাজ পেতে সময় লেগে যেত। শেষপর্যন্ত সকলেই খুশি হয়ে পা ছুঁয়েপ্রণাম করত। হপ্তা পেলেমিষ্টির বাক্স নিয়ে আসত।

হাজিরবাবু। বাবাকে ওই নামেই ডাকত সবাই। ছোটবেলায় ভাবতাম হাজিরা নাম বোধহয়। বড় হয়ে বুঝতে শিখেছি, হাজিরার হিসেবরাখত বাবা। তার ওপরেই হপ্তা। সপ্তাহ শেষের মজুরি। চাঁদমল জুটমিলের চার আনা শ্রমিকেরটিজির তালাচাবি ছিল বাবার হাতের কাগজের ক্লিপে।

রোববারের মাংস, ঝুলনের মেলায় জিভেগজা, ভাড়াকরা বাসে বক্রেশ্বর তারাপীঠ— একবার মাও সঙ্গে গিয়েছিল,ঝড়বৃষ্টির শেষে ঠাণ্ডা আকাশে তে- কোনা চাঁদ উঠলে 'যে রাতেমোর দুয়ারগুলি'। জীবন যে অন্যরকম হতে পারে, তার কোনওসম্ভাবনা আমাদের নিজস্ব পৃথিবীর সামান্য ভগ্নাংশেও ছিল না। এর মধ্যেই পুঁটি এসে গেল। মাকে ক-দিন ধরেই বেশ মোটাসোটা গোলগাল দেখছিলাম। রান্না করতে করতে উঠেদাঁড়িয়ে হাঁফায়। বাবাকে একদিনবলছিল, বুড়ো বয়সে এত আদ মানায় ? লোকে শুনলে ছি ছি করবে। পলু যখন বড় হবে, বুঝতে শিখবে, লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাবে।

একদিন সারারাত মা ছটফট করল। বাবা বাইরে বারান্দায় বসে বিড়ি টানল। জানতে চাইলে মা বলল, পেট ব্যথা, তুইঘুমিয়ে পড়। ভোর হতেই বাবাআমাকে ভঞ্জ কাকিমার কাছে জিম্মা করে মাকে নিয়ে চলে গেল। দু-দিন পরে মা ফিরল। সঙ্গে কাপড়ের পুঁটলি জড়ানো বেড়ালছানারমতো পুঁটি।

সেই সময়েই তফাতটা টের পেতে শু করলাম। মা বলত, অলক্ষ্মী ।এসেছে আমাদের উড়িয়েপুড়িয়ে শেষ করতে।ইচ্ছে করে মুখে নুন দিয়ে শেষ করে দিই। বাবা বলত, ছি, অমন বলতে নেই রমা, অকল্যাণহয়।

বাবা বিড়ি খাওয়া খুব বাড়িয়ে দিয়েছিল।আগে মিলেরবাঁধা সময় ছিল, সাতটার ভোঁ, বারোটার ভোঁ, চারটে আর ন-টারভোঁ। ভোঁ পড়তে খেতে বসত বাবা।মা গজগজ করত, দু-মিনিট আগে বসতেকি হয়। কোনওরকমে নাকে মুখে গুঁজেজুতোটা পায়ে গলিয়ে ছুট লাগাত। আজকাল বাবার সময়ের টানাটানি নেই। গড়িয়ে গড়িয়ে যাওয়া। যখন তখন ফেরা। খেতে বসেভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করা।না খেয়ে উঠে যাওয়া।

একদিন মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, মিলের ভোঁ আর বাজে নামা? মা বলেছিল, পুরোনো যন্ত্র তোখারাপ হয়ে গেছে। বাজবে, শিগগিরইআবার বাজতে শু করবে।

রোজসকালে দাড়ি কামাত বাবা, আজকাল সপ্তাহে একদিনওগালে ক্ষুর পড়ে না। বাবারঅতগুলো দাড়ি পেকে গেছে এই প্রথম জানলাম। মাংস আসে না বাড়িতে। একখানা ডিম সুতো দিয়ে কেটে প্রথমে দুই, তারপর তিনতারপর চার টুকরো করা শু করল মা। স্কুলের প্যান্ট ছিঁড়ে গেলে নতুন কিনে দেওয়ার বদলে ভেতরেকাপড় দিয়ে সেলাই করে দিল। পূজোএসে ঘুরে গেল, আমাদের নতুন জামাকাপড় হল না।

ততদিনে আমিও বুঝতে শিখে গিয়েছি। মিলের বন্ধ দরজার সামনে লাল শালু টাঙিয়েসারাদিন বসে থাকে বাবারা। একদিনবাবাকে আলমবাজারে ড্রামের ওপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতেও শুনে ফেললাম। ভিড়ের পেছনে দাঁড়িয়ে শুনলাম বাবা বলছে,কত বড় অন্যায় ভেবে দেখুন। রথেরচাকা মাটিতে বসে গেছে। একা কর্ণদু-হাতে সেই চাকা টেনে তোলার চেষ্টা করছে। বলছে, একটু অপেক্ষা কর অর্জুন,তোমার যুদ্ধের সাধ আজ মিটিয়ে দেব। শুধু রথের চাকাটা মাটি থেকে তুলে নিতে দাও। কী করল অর্জুন ? কী বলল কৃষ্ণ ? একবীরশ্রেষ্ঠর কাটামুন্ডু মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

বাড়ি ফিরে বললাম, বাব আজ আলমবাজারে বক্তৃতা দিচ্ছিল।মা চোখ নামিয়ে আমাকে ডেকে বলল,একটা কাজ করবি পলু? মার এমন গলাআমি কখনো শুনিনি। অবাক হয়ে তাকালাম।হাতের একগাছা চুড়ি খুলে আমারহাতে দিয়ে বলল, অক্ষয় স্যাকরার কাছে এটা দিয়ে বলবি মা পাঠিয়ে দিল।দুশো টাকা চাইবি। না দিলে যা দেয়নিয়ে চলে আসবি। বলবি, পরে মা ছাড়িয়েনেবে।

দুশো টাকাই দিয়েছিল অক্ষয়। তারপরেও; যতবার গেছি। কোন্য কথা না বলে দুশো টাকা বাড়িয়েদিয়েছে, মা কখনও যায়নি। ছাড়াতে তোনয়ই। হাতের চুড়ি, কানের দুল,হার, বালা। সব এক রেট। পুরনো পোর টাকা ছিল ক-খানা,লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে। কাল সেগুলোওদিয়ে এলাম।

রামাশিস ঠাকুর। বিশ বছর আগে রামাশিসকে পাওয়া যেত ডানলপ ব্রিজের ধারেগজিয়ে ওঠা অজস্র ধাবার যে কোনট ার একপাশে। পান-সিগারেট-খইনি, দরকারে চুল্লুর বোতল। কায়ক্লেশে কেটে যাচ্ছিল। এক বিহারি ড্রাইভার বাঁ হ াতের তালুতেখইনি জলে হাততালি বাজাতে বাজাতে রামাশিসকে বলেছিল, খইনির সব ভালো, এইবানানোর মেহনতটুকু ছাড়া।

কথাটা রামাশিসের মাথায় ঢুকে যায়। তিন বছর জিনিসটা নাড়াচাড়া করে সত্যিইএকদিন মালটা বাজারে নামায়, রেডিমেড খইনি। পড়তেই বাজার ধরে নেয়। রামাশিসকে নিয়ে টানাটানি শু হয়। এর ওর কাছে হাত পেতে রামাশিস একটা কারখানা বানিয়ে ফেলেখইনি ও গুটখার। নামেই কারখানা। একটা টালির চাল, ছোট ঘর আর রামাশিসকে নিয়ে তিনজনমিস্তিরি। দু-বছরের মধ্যেরামাশিসকে কারখানা রেললাইনের ধারে তুলে নিয়ে যেতে হয়। এখন রামাশিস আড়াইশৈো লেবার, চারজনচার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, দু-জন ম্যানেজার পুষছে। পেটব্যথা হলে ভোরের ফ্লাইটে দিল্লি গিয়ে ডাক্তার দেখিয়েসন্ধের ফ্লাইটে ফিরে আসে। অনন্যাসিনেমার কাছে ওর বাড়ির ড্রয়িংমে ঢুকতে হলে চারপ্রস্থসিকিউরিটি ডিঙিয়ে যেতে হয়। গাড়ির কাচও নাকি বুলেটপ্রুফ, ওস্তাদ বলছিল।

ওস্তাদের অনেক কথাই বাড়ানো, এটার মতন। কিন্তু রামাশিস ঠাকুরের কথা এলাকারঅনেকেই জানে। ওর 'সন্তোষীছ াপ খইনি' ও 'গুটখা' অঞ্চলের তাবত ল্যাম্পপোস্টেহ্যাণ্ডবিল হয়ে লটকে থাকে। এলাকারসমস্ত পুজো-ফাংশন-অনুষ্ঠানে সবচেয়ে বড় চঁ াদাটা রামাশিসই দেয়। শুধু খইনি বা গুটখা নয়, রামাশিসএখন ছড়াচ্ছে। শোনা যায কাগজের কল,ফলের রস তৈরির কারখানা একে একে রামাশিসের সাম্রাজ্যে যোগ হবে। জমি নেওয়া হয়ে গেছে। শেড উঠছে। শুধু সময়ের অপেক্ষা।

— এমন লোকেরও শত্রু ?

প্রশ্নের জবাবে ওস্তাদ ঘাড় নেড়েছিল। এদেরই তো শত্রু সবচেয়ে বেশি রে ! যে পোর চামচ নিয়ে জন্মেছেতাকে সকলেই ওইভাবে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কেউ প্রশ্ন করে না। গোলমাল তাদের নিয়েই, যারা তোর-আমারমতো রাস্তার ধারে প্যান্টের বোতাম খুলে দাঁড়িয়ে যায, বাসের রডধরে ঝোলে, কেরোসিনের দোকানে খালি জেরিকেন হাতে লাইন দেয়। তারপর একদিন হঠাৎ তোর পাশে দাঁড়িয়েএ.সি. গাড়ির কাচ নামিয়ে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা, আদ্যাপীঠের মন্দিরটা কে াথায়ভাই ?

তখনই তোর বিচি রগে উঠে যায়। সেটাকে নামানোর চেষ্টা করতেকরতে তোর রাতের ঘুম চলে যায়। শেষ পর্যন্ত লে াকটাকে নিকেশ না করা পর্যন্ত তোরশান্তি হয় না।

এর পরের প্রশ্নটাই করা যেত, তা সেইমানুষটা কে ? কার কাছ থেকেসুপারি নিয়েছ ওস্তাদ ? কিন্তুকরা যায না। ক ারণপ্রশ্নটার জবাব অনেকরকম হতে পারে। ওস্তাদ স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়েথাকতে পারে। মুখ ঘুরিয়ে শুনতে ন াপারার ভঙ্গিতে চলে যেতে পারে। কিন্তু যদি বোঝে সত্যি স্যত্যিই খবরটা আমি ওর থেকে বের করারচেষ্টা করছি, ত াহলে দুটো দানা আমারও মাথার মধ্যে ভরে দিতে পারে। ব্যাপারটা ওস্তাদের কাছে এতসহজ যে প্রশ্নটার ধার দিয়েও কেউ যাই না।

কাউকে নিতে গেলে হয় একদম ফাঁকা জায়গায় নিবি,যেখানে তুই আর ও ছাড়া কেউ নেই। চুপচাপ কাজ হাসিল করে ধোঁয়া ওঠা নলের ডগায় চুমু খেয়ে,'দিল তো পাগল হ্যায়' করতে করতে বেরিয়ে আসবি। আর নিতে পারিস ভিড়ের মধ্যে। হাজারটা লোকের মধ্যে নিজেকে আড়ালকরাই সবচেয়ে সোজা। পাশের জনওজানতে পারবে না তুইই ঘটনাটা ঘটিয়েছিস। এমনকী ভিড়ের পেছনে দাঁড়িয়ে চোখ বড় বড় করে তুই অন্যদেরসঙ্গে আলোচনাও করতে পারিস, দেখেছেন, কী সাংঘাতিক ? দিনের আলোয় সবার চোখের সামনে... কীসাহস!

রামাশিস সম্বন্ধে হোমওয়ার্ক ওস্তাদ আগেই করেনিয়েছে। ওর টিন মোটামুটিনির্দিষ্ট। ভোরবেলা মাঠে হাঁটতেযায়। স ামনে পেছনে চারজন সিকিওরিটিও কে ঘিরে থাকে। কেউ অ্যাটেম্পট্করলে যন্ত্র বের করার আগেই তার শরীরে আটটা দানা পুরে দেবে। ফিরে জলখাবার খেয়ে কারখানা। সেই সিকিওরিটি। সন্ধেবেলা ফিরে খাঁচায় ঢুকে যায়। ভোরের অ াগে বেরোয় না।

তাহলে উপায় ?

হেসেছে ওস্তাদ, ঘাবড়াচ্ছিস কেন? কৃষ্ণেরওগোড়ালি ছিল, রামাশিস কোন্ ছার! রামভক্ত রামাশিস আমিষ ছোঁয় না। কিন্তু একটা জায়গায় ব্যতিক্রম। মা কালী। দক্ষিণেশ্বরেপূজো দিয়েই নাকি ওর রমরমা। যেশনিবার অমাবস্যা পড়ে সেদিন ও দক্ষিণেশ্বরে পূজো দিতে যাবেই। যায় একা । কেউ জানতেও পারে না। চুপি চুপি কারখানা যাবার নাম করেবেরিয়ে যায়, সিকিওরিটিকে গাড়িতেরেখে হেঁটে যায় মন্দিরে। পূজো দিয়েফিরে আসে । পরশু শনিবার, অমাবস্যা,দেরি করা ঠিক হবে না। লেগে যা।

পঞ্চবটীর দিকটা ফাঁকা ফাঁকা। গাছের ছায়াও আছে। গঙ্গার হাওয়া লাগছে চোখে মুখে। তবু বিজবিজেঘাম যাচ্ছে না। জামার হাতায় মুখ মুছেনিলাম। জামা নয়। টি শার্ট। আগে বলত গেঞ্জি, এখন টিশার্ট। গাঢ় রঙের একখানা কিনলে ছ-মাসনিশ্চিন্ত। বুদ্ধিটা কালু দিয়েছিল। এখন অভ্যেস হয়ে গেছে।

একই ফুটোয় পাঁচটা দানা গলিয়ে দিতে পারি এখন। যন্ত্রটাও হাতের বশ হয়ে গেছে। আমিতৈরী। কিন্তু এত দেরি করছে কেনঠাকুরের বাচ্ছা ? আশপাশে দেখেনিলাম। একটা ভেলপুরিওয়ালা, তিনটে বাঁদর, গোটা চারেক বড়লোকেরবেল্লিক বাচ্চা, পেছনে বাদামের ঠোঙা হাতে চাকর।

প্রায় একঘন্টা হতে চলল। রোদ চড়ে গেছে। আজ কি আর আসবে না ? ভাবতে ভাবতে যখন ঠিকই করেফেলেছি, এবারে উঠে পড়া যাক, তখনই সামনের রাস্তায় ছাই রঙাঅ্যাকসেন্টটাকে ঘুরতে দেখলাম। বাঁকের মুখে রামাশিসকে ছেড়ে পাক খেয়েপার্কিং লট-এর দিকে চলে গেল।

চোখের সামনে রামাশিস ডালার ভিড়ে মিশে গেল।বোকার মতো এদিক ওদিক তাকাচ্ছি, হাত কামড়াচ্ছি, হঠাৎ দেখি ভিড়েরওপারে খুচরো ছড়াতে ছড়াতে বড় ঘাটের দিকে যাচ্ছে ঠাকুর।

ভিড় ।ওস্তাদ বলে দিয়েছে, ফাঁকা জায়গা না হলেভিড়ই সই। আর আজ ভিড় হয়েছেওজববর। এত লোক আসে পুজো দিতে ? এত ভক্তির চাষ! ভিড়ে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে আস্তেআস্তে ঘাটের দিকে এগোতে থাকলাম।

ভিড়ে লোকটা একবার হারিয়ে যাচ্ছে, আবার ভেসেউঠছে। জুতো খুলে এসেছে ? গাড়িতে ?হতে পারে। হাতের পোঁটলাটাঘাটের একপাশে রেখে ধুতি খুলে গামছা পরল। একটা ছেলে স্নান সেরে দিগম্বর হয়ে প্যান্ট বদলাচ্ছিল, তাকেডেকে একটা আধুলি হাতে দিয়ে জিনিসটার ওপর নজর রাখতে বলল। তারপর পুণ্যার্থীদের ভিড়ে গা মিশিয়েসোজা নেমে গেল নদীতে।

রামাশিস কি সাঁতার জানে না? তাই হবে। হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে ঘটি থেকে জল ঢেলে গঙ্গাস্নান করল ঠাকুর। একবার ওইখানেই বসে পড়ে ডুব দেবারএকটা ব্যর্থ চেষ্টা করল। তারপর ভিজে ঘাটে ব্যালান্স করে করে ওপরে উঠে এল।

ছেলেটা তখনও দাঁড়িয়ে। হেসে ওর হাতে আর একটা আধুলি গুঁজে দিল রামাশিস। ঘাটের ওপর দাঁড়িয়েই পুঁটলি খুলেপরিষ্কার ধুতি বের করে গামছাটা নীচে নামিয়ে দিল। ধুতিটা দু-ফেরতা করে উড়নির মতোগায়েও জড়িয়ে নিল খানিক। তারপরঘাটের সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল।

আমি তৈরি হয়ে নিলাম। হাত ছুঁইয়ে দেখে নিলাম যন্ত্রটা যথাস্থানে আছে কিনা। নিজের বুকের আওয়াজ এখন নিজেই শুনতেপাচ্ছি। আর দু-ধাপ। পেছনে তাকালাম। ভিড়। দু-স্টেপ গিয়ে ভিড়ের ভেতরে মিশে যেতে পারলেইনিশ্চিন্ত। তখনই ঘটনাটা ঘটেগেল।

ভিজে সিঁড়িতে পা পিছলে দড়াম করে পড়ে গেলঠাকুর। হাতের পোঁটলাটা ছিটকেগেল। চিৎ হয়ে শুয়ে কাতরাতে কাতরাতে ঠাকুর বলল, হায় রাম!

ভেতরে কে যেনবলে উঠল, গদা যুদ্ধে কোমরের নীচে আঘাত করা নিষেধ। ভীম মানল না। বীরশ্রেষ্ঠ দুর্যোধন, ভীমকেযখন আঘাতে আঘাতে কাবু করে এনেছে, তখনই যুদ্ধের সমস্ত নিয়ম তুচ্ছকরে ভীম, উ লক্ষ্য করে গদা চালিয়ে দিল। ভগ্ন-ঊ মহারথী দুর্যোধন ভীমকে উদ্দেশ করে যখন বলল, একীকরলে ভীম, ভীম তখন দ্রৌপদীর গল্প ফেঁদে নিজের পাপ ঢাকারচেষ্টা করল। এরা বীর?

কী যেন হয়ে গেল! হাত বাড়িয়ে দিলাম পড়ে থাকা মানুষটার উদ্দেশে। হাত ধরে রামাশিস উঠে বসল। বলল ভগবান কৃপা করে ভাইয়া।

সারা গায়ে ব্যথা। পাশ ফিরতেও ক্লান্তি। চুপচাপ শুয়েছিলাম, পুঁটি এসে পাশে দাঁড়াল, কী হল? শরীর খারাপ ? মাথ

াটা টিপে দেব?
— দে।
পুঁটি বিছানার পাশে বসল। ওর নরম ঠাণ্ডা হাত রাখল কপালে, জ্বর হয়েছে নাকি রে দাদা?
হাঁটুর বয়েসি বোন। তবু তুমি বলে না। দাদা বলে এই ঢের!
— কী জানি, বলে পাশ ফিরে শুলাম। একেবারে ওরমুখটা ঠিক আমার ওপরে। সদ্য ফোটাপদ্মফুল। শিশির-সমেত। বুকের ভেতরে কটকট করে উঠল। এই মেয়ে এই বাড়িতে ? মানায় ?
পদ্মফুলের চোখে উদ্বেগ।
—এত বেলা অবধি শুয়ে আছিস, তখনই মনে হয়েছিল। ডাক্তারবাবুকে খবর দেবো?
সত্যেন অধিকারী, বাবার এককালের বন্ধু। এখনও ডাকলেআসেন। ভিজিট নেন না। পারলেওযুধটাও পাঠিয়ে দেন।
—না থাক। চান করলে ঠিক হয়ে যাবে।
চান করা অব্দি বলাই ভালো। তারপরেই আসবে ভাত খাওয়া আর দু-দিন চলবে।
পুঁটির দিকে তাকালাম। মার আদল। মা-ই নিজের জায়গায় ওকে বসিয়ে দিয়ে গেছে। প্রথমদিন থেকে।
অবশ্য সেটা প্রথম নয়, শেষ দিন। পুঁটি স্কুল থেকে ফেরেনি, আমি কমলের দোকানে বসে আড্ডা দিচ্ছি, কে যেন ছুটতে ছুটতে গিয়ে খবর দিল, পলু, তোরমা...
ভেতরেঢুকতে হল না। ভিড় ঠেলে এগিয়েদেখলাম মাকে বাইরে শোয়ানো হয়েছে। নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে। ব্যথা-যন্ত্রণা সব উধাও। আগের রাতে আমাদের জড়িয়ে ধরে মার কান্না, সেই জলেরদাগটুকু পর্যন্ত নেই।
বাবার বেলা যা করিনি, তাই করেছিলাম। আছড়ে পড়ে কেঁদেছিলাম। পুলিশ এসে বডি সরিয়ে নিয়ে গেলে অন্যদেরহাত ছাড়িয়ে ছুটে যেতে চেয়েছিলাম।
পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল পুঁটি। ওর সরলতামাখা চোখগুলো প্রজাপতিরমতো মেলে দিয়ে যেন বলেছিল, তুই না বড়? দাদা না তুই? এই সময় শক্তনা হলে চলবে ? লোকে যে ছি ছি করবে ?বলবে, ও নিজেই ভেঙে পড়লে ছোট বোনটাকে দেখবে কে?
আসলে একটা কথাও না বলে সমস্তই বলে গিয়েছিলপুঁটি। ঘরে নিয়ে গিয়েছিল। মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিল। গরম চা করে এনে পাখির মতো একটুএকটু করে খাইয়ে দিয়েছিল। তারপর চোখে আঙুল ছুঁইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল।
আর এই সমস্ত কিছুর মধ্যে বাবা বারান্দায় চৌকিতে শুয়ে একভাবে অর্থহীন দৃষ্টি মেলে তাকিয়েছিল।
বাবার ঘটনাটাও এমনই আকস্মিক। রোজকার মতো মিলের গেটে বসেছিল। কার সঙ্গে কী একটা নিয়ে কথা কাটাকাটি। এমনিতে রাগত না বাবা। সেদিন হঠাৎই রেগে গিয়েছিল। কিছু একটা বলতে গিয়েছিল। ভাষা খুঁজে পায়নি বোধহয়। কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়েছিল। সবাই যখন ধরাধরি করে বাড়ি নিয়ে এল তখনআমি ছিলাম না। মার কাছে শুনেছি। কাপড় নোংরা করে ফেলেছিল। হাত-পা চলছিল না। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। সত্যেনকাকু এসেছিলেন। হাসপাতালে দেওয়ার কথা বলেছিলেন। দু-দিনপরে চোখ খুলেছিল বাবা। এদিক-ওদিকতাকিয়েছিল। বাবার চোখের ভাষা,ঠোঁটের কথা আর ফিরে আসেনি। মা,আমি ও পুঁটি একে একে সামনে গিয়ে দঁড়িয়েছিলাম।
স্নান করানো, জামাকাপড় ছাড়ানো, বিছানা পরিষ্কারকরা মা একা হাতে করত। খাইয়েওদিত। হ্যাঁ, আশর্চ্য হয়ে দেখতাম, যেমানুষটা হাত পা নাড়তে পারে না, কথা বলতে পারে না, সে দিব্যি হাঁ করেএকের পর এক ভাতের গরাস গিলছে। প্রচণ্ড রাগ হত মাঝে মাঝে। মনে হত গলা টিপে ধরি।
মাও মনে হয় হিসাব করছিল। যেটুকু আছে তাতে চারটে পেটের যতদিন চলবে তিনজনেরচলবে তার চেয়ে তিনমাস বেশি। তবুমা এখনও মনে হয় অন্যায় করেছিল। নির্বাক পঙ্গু স্বামী এবং ছেলেমেয়েকে ফেলে রেখে ওইভাবে নিজেকে সরিয়েনেওয়া একধরনের স্বার্থপরতা। তারবদলে অনেক কিছুই করতে পারত মা। যে কোনও ধরনের কাজ। ভালো বা মন্দ।
মা কি আমার ওপর অভিমান করেছিল ? ওই বাবার ছেলে হয়েও লেখাপড়া কিছুইকরলাম না সেই জন্য ? আশপাশ থেকেআমার সম্বন্ধে যেসব কথা মার কানে উড়ে আসছিল, বারবার আমাকে জিজ্ঞেস করেওসদুত্তর পাচ্ছিল না সেই জন্য

? এতখানিবয়েসের পরেও যে দায়িত্ববোধ তৈরি হল না, ছোটবোনটার মুখের দিকেতাকিয়ে যদি সেইটা জন্মায় তার জন্য ?

মা নেই, বাবার পেট ছাড়া কিছুই নেই, তখন মা হয়েদিদি হয়ে বোন হয়ে আমাকে আগলে রাখল পুঁটি। পুঁটি কিন্তু লেখাপড়ায় যথেষ্ট ভালো। আমার সঙ্গে কোনও মিল নেই। পাড়ার মানদাসুন্দরীতে পড়েও কারও সাহায্যছাড়াই মাধ্যমিকে ফার্স্ট ডিভিশন, দুটো বিষয়ে লেটার। ওকে হায়ার-সেকেন্ডারীতে ভরতি করেবাবার হারমোনিয়ামটা বেচে দিলাম। ও,পাশ করে যাবে, করবেই, আমি জানি।

—উঠছিস কেন? আর একটু শুয়ে থাক। আমি মাথা টিপে দিচ্ছি।

পুঁটির হাত সরিয়ে উঠে পড়লাম। ঘড়ি দেখলাম। চারটেয় মিটিং। সাত-আট ঘন্টা সময় আছে। আজ না পারলে ওস্তাদ আমাকে কেটে ফেলবে।

সেদিন ফিরে যেতে মুখ দেখেই বুঝে ফেলেছিল। রগের কাছে টিপে ধরেছিল। চোখ-মুখ অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। দম আটকে ছটফট করছিলাম।

কানের কাছে মুখ লাগিয়ে ওস্তাদ বলেছিল, পারিনিবলবার জন্যে ফিরে আসবি না, বুঝতে পেরেছিস? পাশে পঞ্চবটীতে তো দেদার উঁচু উঁচু গাছ ছিল। ঝুলে পড়তে পারলি না ? শুনে রাখ। পরের বার না পারলে আমিই তোর কপালে তিনখানা দানা ভরেদেবো। কেউ ঘুণাক্ষর্যে জানতেপারবে না।

ওস্তাদ চেঁচায় না, এতটুকুও উত্তেজিত হয় না। খরিশ সাপের মতো ফিসফিস করেকথাগুলো শুনিয়ে দেয়।

আজ বিকেলে আমার লাস্ট চান্স।

পুঁটির দিকে তাকালাম। ওর জন্যে আমাকে আজপারতেই হবে।

গেটে এসে বুঝতে পারলাম, ওস্তাদ কার্ড জোগাড়করে না দিলে আমার পক্ষে ঢোকা আদৌ সম্ভব হত না।

উঁচু পাঁচিল, উর্দি-পরা দারোয়ান, নীল নীল স্কুলবাস। পরীর মতো মেয়েরা নেমে দল বেঁধে স্কুলে ঢুকে যায়, বিকেল হলেবেরিয়ে এসে কোনওদিকে না তাকিয়ে বাসে উঠে পড়ে । এর মধ্যেই নামকরেছে। সন্টলেক-শ্যামবাজার থেকেও মেয়েদের পড়তে পাঠাচ্ছে বাবা-মায়েরা।

ওস্তাদ বলেছিল, দুটো কারণে জায়গাটাআইডিয়াল। এক তো ভিড় । অত লোকের মধ্যে গা ঢাকা দেওয়া সহজ। দ্বিতীয় কারণ রামাশিসকে এখানে খুবই সহজেইপাওয়া যাবে, সিকিওরিটিকে ভেতরে ঢুকতে দেবে না। তার চেয়েও বড় কথা, অতগুলো মেয়েচারপাশে কিলবিল করছে, রামাশিস তো ছার, শিবঠাকুরেরও বেল্ট ঢিলেহয়ে যেত।

গেট-এ কার্ড দেখতে চাইল। প্রথমে ভেবেছিলাম রামাশিসের সিকিওরিটি। পরে ভুল বুঝতে পারলাম। রামাশিসের গাড়িটা ওই তো গেটের বাইরেপার্ক করা। ওর ড্রাইভার আরসবসময়ের বডিগার্ড বনেটে বসে পান চিবোচ্ছে। এরা স্কুলের নিজস্ব লোক। ভাড়া করাও হতে পারে। বাইরের লোক আসছে বিস্তর, হুজ্জুত-হাঙ্গামা হতেকতক্ষণ? নিজস্ব সিকিওরিটিথাকাই মঙ্গল।

লোকগুলোকে মেপে নিলাম । না, তেমন শক্তপোক্ত নয়। রাস্তার ওপারে হিরো হণ্ডাটা দেয়ালেঠেকিয়ে নীলু বসে আছে। ওর কাছেওএকটা লোডেড মেশিন আছে।

কার্ড নিমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য, তার মধ্যে গার্জেনরাওপড়ে। আমার কার্ড উলটে-পালটেদেখল, আমাকেও তিনবার মাপল। নরেনেরদোকান থেকে ধার করে এক সেট ভালো প্যান্ট-শার্ট পরে এসেছি, দাড়িকামিয়েছি, নীলুর রোদ চশমাটা চোখে দিয়েছি, বাটার জুতোটা গলিয়েছিপায়ে, তবু সব করেও বয়েসটাকে তো মারতে পারিনি। চতুর্থবার সুরত মেলাবার চেষ্টাকরছিল সিকিওরিটি, বাঁচিয়ে দিল পেছনের এক স্তম। হোমড়া-চোমড়া অফিসার কেউ হবে। এক ধমক দিয়ে বলল, কী হল ভাই, কার্ড দেখেছেড়ে দেবেন, তাতেই এতো সময় লাগিয়ে দিচ্ছেন ?

হাতের ঠেলায সামনে এগিয়ে দিয়ে পরের জনকে নিয়েপড়ল সিকিওরিটি।

ভেতরে পুরোটাই মেয়েদের রাজত্ব। স্কুল ড্রেস পরেছে সবাই। লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রাস্তারদু-ধারে। ঢুকতেই হাতে একটাগোলাপফুল দিল। সঙ্গে কার্ড, তাতেলেখা ওয়েলকাম।

ওস্তাদ বলে দিয়েছিল, প্রাইজডিস্ট্রিবিউশনের ফাংশন। বিল্ডিং বাড়ানোর পরিকল্পনা স্কুল কর্তৃপক্ষের। ঠাকুরকে মুরগি

করেছে। প্রধান অতিথি করে এনে ওর হাত দিয়েইপ্রাইজ দেওয়াবে। তারপর বড়একটা ডোনেশন ম্যানেজ করবে। রামা শিস ধুরন্ধর লোক। ধান্দা ঠিকই বোঝে।কিন্তু এতবড় একটা সুযোগ। টিভি, খবরের কাগজ, টাকা অনেক হয়েছে। এবারেচ াই প্রচার।

সামনের সারিতে কোথাও বসে আছে রামাশিস। মঞ্চ ভরতি কুচোর দল। একজন বাচচামতোদিদিমণি শান্ত করার চেষ্টা করছে। কে শোনে কার কথা ? কিচমিচ কিচমিচ করেই যাচেছ। সবাই পরী সেজেছে। দু-খানাডানাও বেঁধে দিয়েছে কেউ।

দেখতে দেখতে পুরনো একটা দিনের কথা মনে পড়ে গেল। পুঁটিদের ইস্কুল। এত বড় বাড়ি রংচং ব্যাণ্ডবাদ্যি কিছুই নেই। ইউনিফর্ম একটা আছে। তাও না পরে গেলে কেউ দাঁড় করিয়েরাখে না। সেই স্কুলে একবার স্বাধীনতাদিবসের ফ াংশান হয়েছিল। লালপাড় সাদাশাড়ি পরিয়ে দিয়েছিল মা। শাড়ি পরেপুঁটিকে সত্যিসত্যিই একটা পুঁটলির মতো ল াগছিল। বাবার হাত ধরে যেতে যেতে ও হঠাৎই আমারদিকে ঘুরে বলেছিল, দাদা, তুই দেখবি না ?

খুব ভালো লেগেছিল। মনে হয়েছিল আমি দেখি ও এটা চায়। ততদিনে স্কুলের পাট চুকিয়ে দিয়েছি। কিন্তু এ-তো আম ার স্কুল নয়। পুঁটির স্কুল।

ওদের এমন ঘেরা-মাঠ, উঁচু পাঁচিল, দারোয়ানকিছুই ছিল না। স্কুলের সামনে একটাফাঁকা জায়গা, সেখানে লোহার ড াণ্ডা পোঁতা, যার মাথায় কাত হয়ে ঝুলছিলজাতীয় পতাকা। দড়ি টেনে তার ঘুমভাঙানো হল। মাটিতে ঝরে পড়লকয়েকটা শুকনো গাঁদা ফুল। খইয়েরমতো কয়েকটা হাততালি। তারপরসমবেত সঙ্গীত। ‘ হও ধরমেতে ধীর হও কর মেতে বীর’। এক দিদিমণি হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান ধরলেন,‘আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে’ ।

পুঁটিকে সেদিন দেখেছিলাম। যেন অন্য পংুটি। অচেনাকেউ। ওর হাতে চোখে পায়েসুর-তাল-ছন্দ খেলা করছিল। মনে মনেঅনেক আদর করেছিলাম। বাড়ি ফেরারসময় বাবা লজেন্স কিনে দিয়েছিল। পুঁটির জন্যেই শুধু, কিন্তু আমার একটুও খারাপ লাগেনি। মনে হয়েছিল পারলে আমিও তো কিছু একটাদিতাম।

হঠাৎ মাইক গম গম করে উঠল, এবারে পুরস্কার দিতেমঞ্চে আসছেন স্থানীয় সমাজসেবী কর্মবীর শ্রী রামাশিস ঠাকু র। এদের ইংরেজি স্কুল। বাংলায় বলার জন্যে ভাড়া করে ঘোষকএনেছে। রামাশিস ধুতির কোঁচা সামলে মঞ্চে গিয়ে উঠল। আমিও উঠে দাঁড়ালাম।

অন্তত বিশ পা হেঁটে যেতে হবে। ভিড়। কেউ লক্ষ করছে মনে হয় না। সবার চোখ মঞ্চের ওপর। অনেকেই ছবি তুলছে। তাদের পাশে একটু জায়গা করে নেওয়া। তারপর ক্যামেরার বদলে মেশিন।

কিন্তু আমার পা নড়ছে না যে ! এপাশে ওপাশে সামনে পেছনে ভিড় করে আছেঅজস্র অসংখ্য পুঁটি। তাদের লাল ঠোঁ াটতিরতির করে কাঁপছে, পিঠের ডানা নড়ছে হাওয়ায়। চোখে চিকচিক করছে প্রত্যাশা। কেউ পুরস্কার নেবে। কেউ ন াচবে, কেউ গানে গানে ভরিয়ে দেবেসন্ধ্যার আকাশ।

তা যদি না হয় ? মঞ্চে দাঁড়ানো মানুষটা বুক চেপে ধরে লুটিয়ে পড়বে। রক্তে ভেসে যাবে চারপাশ। ছুটোছুটি,চিৎকার, অন্ধকার, পুলিশ, আতঙ্কে নিষ্পাপ মুখগুলোর নীল হয়েযাওয়া! সমস্ত প্রত্যাশা এইখানে শুইয়ে রেখে ঘরে ফিরে যাওয়া !

ঘুরে দাঁড়ালাম। দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম বাইরে। প্রথম লাথিটা এসে লাগলবুকে। ছিটকে পড়লাম। উঠেদাঁড়াতে না দাঁড়াতেই দ্বিতীয় লাথি। এবার মাথায়। মাথাতোলার আগেই আর একটা । তারপরবুকে পেটে ঘাড়ে পিঠে একটার পর একটা । একসময় ব্যথা যন্ত্রণার বোধ আর রইল না। জ্ঞান হারালাম।

গভীর ঘুমের ভেতর থেকে উঠলে যেমন, কোথায় আছি কী করছি বোঝা যায়না, তেমনি, প্রথমে কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। মাথাটা বেবাক ফাঁকা। কিন্তু দশমণ ভারী। হাত তুলতে গিয়ে দেখলাম পারছি না। বুকেও অসহ্য ব্যথা।

কানের মধ্যে ভোঁ ভোঁ আওয়াজ। তারই মধ্যে চলন্ত ট্রেনের ওপাশ থেকেকথা বললে যেমন শোনা যায়, কে যেন বলল, প্যালা, এই প্যালা শুনতে পাচ্ছিস? চোখ খুলে দেখার চেষ্টা করলাম। পাতা দুটো এত ভারী খুলে রাখতেপারলাম না। চোখের ওপর, মুখে,গালের পাশে চটচটে আঠালো কী লেগে রয়েছে। একটা আঁশ আঁশ গন্ধ।

এবারে কানের একদম কাছে মুখ লাগিয়ে বলল, প্যালা, আমিনীলু বলছি রে! শুনতে পাচ্ছিস ?

অনেক কষ্টে ঘাড় নাড়িয়ে বললাম, হ্যাঁ। আমি কোথায় ?

নীলু বলল, শোন, চুপটি করে শুয়ে থাক। আমি মগে জল নিয়ে আসছি। মুখে চোখে ছিটিয়ে নে। ভালো লাগবে।
পায়ের শব্দে বুঝলাম, নীলু চলে গেল। জল ছিটিয়ে নেব ? আমি? হাত নাড়ানোর ক্ষমতা নেই, আমি কীকরে জল ছিটে াব? মাথার মধ্যে হাতুড়িপিটছে। চুপচাপ শুয়ে রইলাম।
একটু পরে নীলু ফিরে এল, —পারবি ?
ঘাড় নাড়লাম।
মাথাটা তুলে ধরে আঁজলা করে জল নিয়ে মাথায় মুখেবুলিয়ে দিতে লাগল নীলু। ঠাণ্ডা জল। ছোটবেলায় পড়েছিলাম, জলই জীবন। কোন মহাপুষ বলেছিল? খাতা ভরতি করে আমিও একই কথা লিখতাম।
মাথার দপদপানিটা কমে এল, হাতে পায়ে জোর ফিরেএল, কষ্ট করে হলেও নীলুর কাঁধে ভর রেখে উঠে বসতে পারলাম। তারপর চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম,ওস্তাদের আখড়ার বাইরে নিমগাছের নীচে বসে আছি।
—ওস্তাদ কোথায়?
নীলু চুপ করে রইল। তারপর গলা নামিয়ে বলল, ওস্তাদ তোকে সত্যিই ভালোবাসেরে!
কথাটা নিষ্যস সত্যি। ওস্তাদের ভালোবাসা সমস্ত শরীরে টের পাচ্ছি। দু-খানা পাঁজরা ভেঙেই গেছে, ডানচোখটায় দেখতে পাচ্ছি না, বাঁ হাতের কনুইটা ফুলে গদা হয়ে গেছে।
—পলাশ ঠিক এই জিনিসই করেছিল। দু-বার চান্স দিয়েছিল ওস্তাদ, তারপরওইখানে, ওই পাঁচিলের সামনে রড দিয়ে মাথা দু ফাঁক করে দিয়েছিলপলাশের। লাশটা আমরাই বস্তায়ভরে রাতের অন্ধকারে রেললাইনে ফেলে দিয়ে এসেছিল াম।
পলাশ ? তা হলেরেলে কাটা পড়েনি ? আমাকেওওস্তাদ ? কই না তো ? এই তো, এখনও বেঁচে আছি।
—হাত তুলেছিল ওস্তাদ। মেরেই ফেলত। কী যে হল! হাত নামিয়ে নিল । আমার দিকে ফিরল। বলল, লাইনে একদম নতুন। আর একটা চান্স দিলাম। তোকে বুঝিয়েদিচ্ছি। উঠলে বলিস । তোর ওপরেই দায়িত্ব। না পারলে আজই শেষ দিন।
গাছে হেলান দিয়ে বসেছি। গা বেয়ে কাঠ পিঁপড়ে ঘুরে বেড়াচেছ। কামড়াচেছ না। কামড়ালেও ব্যথা লাগবে না।
—ঠাকুরের একটা বাঁধা মেয়েমানুষ আছে,। ন-মাসে ছ-মাসে যায়। আজ যাবে। ওস্তাদ বুঝিয়ে দিয়েছে। ওটাই তোর লাস্টচান্স।
—আমি ? এইঅবস্থায়? পাগল হয়েছিল?
— পারবি। পারতেই হবে। আমি থাকববাইরে। চল্। ঝেড়ে মেরে উঠে পড়। দু-পা হাঁট। সঙ্গে মাল আছে। দু-চুমুকগলায় ঢেলে নে। দেখবি আর কষ্ট হচেচ না।
উঠতে গিয়ে টলে পড়ে যাচ্ছিলাম। নীলু ধরল। একটু একটু করে পা ফেলে দেখলাম, কষ্ট হচেচ কিন্তু একদমপারছি না ত া নয়। নীলুর বাড়ানোহাত থেকে ছোট পাঁইটটা নিয়ে গলায় খালি করে দিলাম। তারপর ওর গায়ে ভর দিয়ে হেঁটে ব াইরেরাস্তা অবধি এসে দেখলাম, পারছি।
নীলুর বাইকটা দাঁড় করানো ছিল। বলল, একবার বাড়ি হয়ে যাব ?
—আবার? ওই করতে গিয়েই গেলি। আর মায়া বাড়াতে হবে না।
—একটা অনুরোধ রাখ্ ভাই। আর কোনওদিন কিছু বলব না। একবার বাড়ি ঘুরে না গেলে আমি পারব না।
—তোকে নিয়ে সত্যি পারা গেল না। বলতে বলতে বাইক ঘুরিয়ে নিল নীলু।
অন্ধকারে ভূতের মতো দেখাচেছ বাড়িটা। বাইরে থেকে হাত গলিয়ে নিঃশব্দ শিকল খুলেভেতরে ঢুকলাম। বারান্দায় শুয়ে থাকাবাবাকে পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখলাম আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পুঁটি। আয়নায় আমার ছায়া পড়ল। চমকে ঘুরে তাকাল। আমার দিকে চোখ পড়তেই ওর মুখফ্যাকাশে হয়ে গেল।
—দাদা তুই ? কী হয়েছে তোর ? পড়েগিয়েছিলি ?
কথা শেষ করতে দিলাম না পুঁটিকে। চুলের মুঠি ধরে টেনে আনলাম নিজের কাছে।
—কী ব্যাপার? এত সাজগোজ করে কোথায় বেনো হচেছ? যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছিল পুঁটি। ছাড়িয়ে নেবার জন্য ছটফট

করছিল। এক ঝটকায় ঘাড়টা ঘুড়িয়ে মুখটা নিয়ে এলাম মুখের কাছে।
— ছেনালি করতে যাওয়া হচ্ছে ? দাদার পয়সায় ঠোঁটে রং মেখে খানকিগিরিকরতে যাচ্ছ ? বল্ কোথায় যাচ্ছিলি ?
কী যেন বলতে গেল পুঁটি। ওকে সেই সুযোগই দিলাম না। মাথাটা ঠুকে দিলাম খাটের ছত্রিতে। কাটা কলাগাছের মতো লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।
ফিরে তাকালাম না। বেরিয়ে যেতে যেতে ঘুরে দেখলাম, বাবা। একভাবে হাঁ করে ছাদের দিকে তাকিয়েরয়েছে। লাফিয়ে সামনে গেলাম।
—হাঁ করে কী দেখছ ? সারাজীবন হাঁ করে করে বাণী মারিয়েছ। এখন কুমিরের হাঁ করে ছেলের রোজগারেগিলছ। লজ্জা করে না ? তোর হাঁ করা মুখে আমি পেচ্ছাপ করি।
পুরোনো একটা হাতপাখা বাবার মাথার কাছে থাকে। মা হাওয়া করত। পুঁটিও করে মাঝে মাঝে। পাখাটা তুলে হাতলটা বাবার হাঁয়ের মধ্যেগেঁথে দিলাম। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছিলবাবার। চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল। আরও ভেতরে ঢোকাতে ঢোকাতেহিসহিস করে বলে উঠলাম, খা, জন্মের শোধ খেয়ে নে।
এক লাথিতে দরজা খুলে গেল হাঁ করে। ছুটে গিয়ে নীলুর পেছনে বসে বললাম, চল্।
নীলু দেখছিল । বলল, তোদের দরজা ?
— থাক । আর বন্ধ করার দরকার নেই।
জয়শ্রী সিনেমার উলটোদিকের গলি। একটা পুরোনো বাড়ি ভেঙেপ্রোমোটার নতুন বাড়ি বানাচ্ছে। সামনে বাইক দাঁড় করাল নীলু। টেনে ভেতরে নিয়ে গেল। রাত হয়ে গেছে। কেউ নেই। একপাশে কিছু চুন-সুরকি জড়োকরা।
পাশে বসিয়ে মেশিনটা আমার হাতে দিয়ে বলল, একটাইগুলি আছে। পাশের বাড়ি, ওই যেদেখছিস, হার্ডওয়ারের দোকান, তিনতলায় ঠাকুরের ফ্ল্যাট। সামনে ওর লোক পাহারা দিচ্ছে। যেতে পারবি না। এখান দিয়েই উঠে যা। সিঁড়িটা দোতলা অবধি হয়েছে। একটা তলা ভারা বেয়ে উঠতে হবে। সামনেই দেখবি ব্যালকনি। পা বাড়ালেই পেয়ে যাবি। পাশের ঘরেই বসে আছে ঠাকুর।
তাকিয়ে দেখলাম। ইট বের করা সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। দোতলার ছাদ ঢালাই হয়েছে। বাকিটা এখনও রডের খাঁচা । তবে পাশেই বাঁশের ভারা। ওঠা যায়। সামনের বাড়িটার একতলায় দোকান। দোতলা-তিনতলায় ফ্ল্যাট। দোতলাটা অন্ধকার। তিনতলার পেছনদিকে ব্যালকনি। পাশের ঘরে আলো জ্বলছে।
নীলু তাকিয়ে আছে আমার দিকে। ও বলেনি। কিন্তু আমি জানি, ওর জামার নীচে গোঁজা আছে ছ-ঘরা একটা মেশিন। সেটার সবকচটা গর্তেই দানা ঠাসাআছে। না পারলে আমাকে ফিরে যেতেদেবে না নীলুই।
তরতর করে উঠে গেলাম সিঁড়ি বেয়ে। পশ্চিমদিকের দেয়াল বেয়ে ধরে ফেললামবাঁশের ভারা। চড়লাম আরও কিছুটা সামনে ব্যালকনি। ডান হাত বাড়িয়েকার্নিশ ধরে পা দিয়ে আলসে ছুঁয়ে ফেললাম। এক ঝটকায় শরীরটা টেনে আনলাম এদিকে।
ব্যালকনির পরে ঘর। মাঝের দরজা খোলা। খালিগায়ে কোমরের কষি আলগা করে বসে আছে রামাশিস। টিভি চলছে। টিভিতে ব্লু ফিল্ম। ক্যাসেটে গান বাজছে। পাশেবাথমে জলের আওয়াজ। ঘরে ঠাকুরএকা।
পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকাল রামাশিস। আমাকে দেখে ওর চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এল। বিপদে কি মানুষ চিৎকার করতেভুলে যায় ? কপালের মাঝখানে ভুরএক ইঞ্চি ওপরে নির্ভুল লক্ষ্যে চালিয়ে দিলাম।
হুমড়ি খেয়ে কার্পেটের ওপর শুয়ে পড়ল রামাশিস। টি ভি, গান, জলের আওয়াজে গুলিরশব্দ চাপা পড়ে গেল।
একবারই আওয়াজ হয়েছিল। একটাই গুলি বেরিয়েছিল আমি নিশ্চিত। রামাশিসের মৃতদেহ পড়ে রয়েছেকার্পেটের ওপর, নিথর।
বেরিয়ে যেতে যেতে দেখলাম দরজার দু-পাশে শুয়ে আছেআরও দু-জন। মৃত। আমার অতীত এবং আমার বিবেককে ডিঙিয়ে অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলাম। নীলু আমার জন্যেই অপেক্ষাকরছিল।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com